বেতার-স্মৃতি

শাঁওলী মিত্র

বেতার নাটকে যে ঠিক কবে অভিনয় করতে শুরু করেছিলাম মনে নেই। ১৯৬৮ কিংবা '৬৯—নাকি '৭০?—এরকমই কিছু একটা হবে।

অডিশন দিতে গিয়ে একটি স্ক্রিপ্ট পাওয়া গেল হাতে—ঘটনাচক্রে খুব পরিচিত নাটক। 'বহুরূপী' নাট্যপত্রিকায় একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছুদিন আগে। সেই নাটকেরই অংশ। আমাকে প্রায় সবশেষে ডাকা হল। অতক্ষণ ধরে দেখছি—কাউকে এক পাতা, কাউকে বা দেড় পাতা—ব্যাস্, তারপরেই থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমিও সেইজন্যে দুটি পাতা বেশ ভালো করে পড়ে রেখেছি। মনে নেই কত পাতা ছিল। পাঁচ-ছ' পাতা হবে বোধহয়। আমি পড়তে শুরু করলাম, কেউ আমাকে থামাচ্ছেন না। শেষপর্যন্ত পুরোটা

শেষ হয়ে গেল। আমি হাঁদার মতো এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি। কাঁচের জানালায় পর্দা দেওয়া। পাশের ঘরে কারা আছেন আমার কোনো ধারণাই নেই। মনে হল কেউ হয়ত ঐ সময়ে ছিলেন না! অথবা কেউই শুনছিলেন না! কী জানি কী হয়েছিল। যাইহোক পাশ তো করলাম। প্রথম ডাক পেলাম শ্রীধর ভট্টাচার্যের প্রযোজনায়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, নীলাদ্রিশেখর বসু—এঁরা ছিলেন সেই প্রযোজনায়। প্রথম থেকেই মূল চরিত্রে অভিনয় করেছি আমি, সাধারণ ভাবে। সেই থেকেই স্বাধীন ভাবে বেতার মাধ্যমে অভিনয় করবার শুরু। তখন পারিশ্রমিক ছিল পনেরো টাকা। আমার কাছে অনে-ক! হাতখরচের কত যে সুবিধে হত! আকাশবাণীতেই সম্ভবত আমার জীবনের প্রথম উপার্জন।

কিন্তু তখনই কি প্রথম আমি আকাশবাণীতে অভিনয় করলাম? না! তার ২/৩ বছর আগে করেছি 'ডাকঘর'। যেটা করার পরে খুব ধন্যি-ধন্যি হয়েছিল। তখন তো শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় রেডিয়ো-তে নাটক শোনেন না, এমন মধ্যবিত্ত বাড়ি প্রায় ছিল না। সেইজন্যেই লোকের মুখে-মুখে অত বেশি ফিরেছিল 'ডাকঘর' নাটকের কথা। কিন্তু 'ডাকঘর'-এরও আগে, আরো অনেক ছোট্টবেলায়, রেডিয়োতে অভিনয় করেছি আমি। 'ডাকঘর' যেমন 'বহুরূপী'র প্রযোজনা ছিল, তেমনি সেই প্রযোজনাটিও 'বহুরূপী'র। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে এক মুসলমান পরিবারের করুণ কাহিনী! 'ছেঁড়া তার'-এ প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটত। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় রাজনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এক অত্যন্ত সাহসী প্রযোজনা। যে-দম্পতিকে ঘিরে এই কাহিনী, আমি কিছুদিন সেই দম্পতির একমাত্র সন্তান বসিরুদ্দীন-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। সেইসময়ে এর রেকর্ডিং হয়। সেটা পঞ্চাশের দশকের শেষদিক হবে। তখনও 'আকাশবাণী ভবন' তৈরি হয়নি। গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে রেকর্ডিং হয়েছিল। তবে সেই পরিবেশ আমার ভালো মনে পড়ে না। মনে আছে বহুরূপীর সবাই মিলে একসঙ্গে বসে সেই নাটক শোনার কথা। আমাদের বাড়িতে তখন রেডিয়ো ছিল না। সে এসেছে ঢের পরে। আমার এক মাসির বাড়িতে সবাই মিলে 'ছেঁড়া তার' শুনতে যাওয়া হয়েছিল, সে-

কথাটা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলছি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই সে সময়ে ঘরে-ঘরে রেডিয়ো ছিল না। আর আমার মা-বাবার তো রেডিয়ো কেনার পয়সাই ছিল না। 'সেতু' নাটক করতে করতে কোনো এক শততম রজনীতে মা একটি ট্রানজিস্টর উপহার পেয়েছিল। তখন সবে ঐরকম সেট বাজারে বেরিয়েছে। সেই প্রথম আমাদের বাড়িতে রেডিয়ো এল।

সত্তরের দশকের শেষে বা আশির দশকের গোড়ায় অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছি। বেশির ভাগই ভুলে গিয়েছি। দু-একটির কথা মনে আছে। তখন আকাশবাণীর মাইক্রোফোন ভালো ছিল, ট্রান্সমিশন ভালো ছিল। স্বরের অভিনয় নিয়ে অনেকরকম নিরীক্ষা করবার সুযোগ ছিল। করেওছি তা। খুব মজা লাগত। যাকে বলে, কাজ করে আনন্দ পাওয়া। স্ক্রিপ্ট কাটাকুটি করা, মহলা দিয়ে অভিনয়ের তাল ঠিক করা, পরস্পরের সঙ্গে লয় মেলানো, ধরা-ছাড়া রপ্ত করা, প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ—এ সমস্ত কিছুরই মধ্যে খুব আনন্দ ছিল। যে দু-একটির কথা মনে আছে তার একটি হল 'আঁধার পেরিয়ে'। মূল চরিত্রে কণিকা মজুমদার। তাঁর স্বামী করেছিলেন দিলীপ রায়। আর আমি সেই উচ্ছল অল্পবয়সী মেয়ে। সেইখানে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ির একটা অংশ ছিল। বরফ নিয়ে খেলা, পড়ে যাওয়া, গড়ানো, —এইসব। এখনও কাউকে কাউকে সেই অভিনয়ের উল্লেখ করতে শুনলে অবাক লাগে। সে যে কত যুগ আগের কথা। তেমনিই আর একটি নিরীক্ষা— 'কোনি'। সাঁতার কাটতে কাটতে জল থেকে কথা বলা। সেই কল্পনা দর্শকের মনে এঁকে দেওয়া যাবে কী করে? সেই নিয়ে চলল তখন গবেষণা।

আকাশবাণী তথা বেতার অভিনয়ের সূত্রে আমি কিছু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম—সে আমার সৌভাগ্য। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন খুব পুরোনো যুগের। যেমন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়— 'পথের পাঁচালী'র বিখ্যাত 'অপুর বাবা', 'কবি' সিনেমার খ্যাতিমান নায়ক রবীন মজুমদার। এঁরা তখন দুর্বল, চোখে কম দেখেন। আমরা অনেকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে এঁদের

দেখাশোনা করেছি, সাহায্য করেছি—আর অনাবিল স্নেহের ধারা আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়েছে আমাদের মাথায়।

শুধু 'আকাশবাণী' নয়, তখন বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপনের নাটক প্রচারিত হওয়া শুরু হয়েছে। '৭৮ কি '৭৯ সালে শ্রাবন্তী মজুমদার এইরকম নাটকে অভিনয়ের জন্য আমাকে ডাকলেন। সেই থেকে হ্যারিংটন স্ট্রীটের লিভিং স্টুডিয়োতে আমার যাতায়াত শুরু হল। দশ মিনিটের নাটকও হয়, পনেরো মিনিটেরও হয়, পঁচিশ মিনিটের নাটকও হয়। এক একদিনে তিনটে/ চারটে করে নাটকের রেকর্ডিং হয়। এখানেও নিরীক্ষার ব্যাপারটা খুব ছিল। বরং বেশিই ছিল। খুব ভালো, খুব সিরিয়াস গল্পের নাট্যরূপে আমরা অভিনয় করেছি সেই সময়ে। আর খুব তৃপ্তি পেয়েছি। এখানেই শুরু হল সিরিয়াল নাটক—পি থ্রি রহস্য সিরিজ, অ্যারেবিয়ান নাইটস্ ইত্যাদি। সেই সময়টা আমরা যারা যারা ঐ মাধ্যমটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তাদের খুব কাজের আনন্দের সময় ছিল। বিভিন্ন চরিত্র, তাদের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। সেই অনুযায়ী স্বর এবং বাচনভঙ্গির প্রয়োগ। রোজই, প্রায় রোজই নিরীক্ষা। রোজই আবিষ্কার! মাইক্রোফোন ব্যবহার করবার শিক্ষা—রোজই, কাজের মাধ্যমে। প্রায় প্রত্যহ যেখানে রেকর্ডিং হয় এবং মোটামুটি একই লোকেরা অংশগ্রহণ করেন—সেখানে একটা অদ্ভুত বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। সংলাপ ধরা-ছাড়ার, অভিনয়ের। তাতে অন্য ধরনের নিরীক্ষায় মন দিতে সুবিধা হয়। আমাদের তাই হয়েছিল। আমি, ধীমান চক্রবর্তী, গৌতম চক্রবর্তী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র বসু, উর্মিমালা বসু— প্রায় প্রত্যহই ছিল দেখাশোনা, গল্প-আড্ডা, মুড়ি খাওয়া, কফি খাওয়া এবং কাজ। মিহিরদা, মিহির সেন, কী ভালো নাট্যরূপ দিতেন! কী ভালো নির্বাচন ছিল তাঁর! কিছুদিন পরে আমি নাট্যরূপ-ও দিতে শুরু করেছিলাম। সে-ও অসংখ্য। প্রচুর ভালো ভালো গল্পের, বড়ো মাপের লেখকের ভালো গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল।

'নাথবর্তী অনাথবৎ' মঞ্চস্থ হল ১৯৮৩ সালে। তারপর 'পঞ্চম বৈদিক' এবং আমাদের ট্রেনিং উইং 'পঞ্চমবেদ চর্যাশ্রম' নিয়ে প্রবল ব্যস্ততা শুরু হল।

ফলে ঐ কাজে একটু ভাঁটা পড়ল। তারপর ক্রমশ কাজের ক্ষেত্রগুলোও ঠিক তেমনটি আর রইল না। কেমন কেমন করে যে ঐ ক্ষেত্রটা নষ্ট হল, সেটা যাঁরা তখন প্রযোজনা করতেন তাঁরাই বলতে পারবেন। সে কী আকাশবাণীতে, কী অন্যত্র। এর নিশ্চয়ই অনেক রকম কারণ ছিল, অনেক জটিল স্তর ছিল তার,—এর বিশ্লেষণ হওয়াটাও খুব জরুরী।

আর একটি কাণ্ডও ঘটল। টেলিভিশন-এর গ্ল্যামার বেড়ে গেল। টেলিভিশন কেনা অনেক সহজ হয়ে গেল মানুষের পক্ষে। তাই বেতার-শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা কমল, দূরদর্শন দর্শকের সংখ্যা বাড়ল। ক্রমশ দূরদর্শন শুধু সন্ধ্যেবেলা নয়, দিনের অনেকটা সময় জুড়ে অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। তারপরে অজস্র চ্যানেল এসে গেল। সারাদিন ধরে, এখন তো চব্বিশ ঘণ্টাই, বিভিন্ন চ্যানেলে বাংলা সিনেমা, হিন্দী সিনেমা। ভালো-খারাপ, শ্লীল-অশ্লীল, হরেকরকমের চ্যানেলে হরেকরকমের সিনেমা। অনেক বৈভব, অনেক না-ছুঁতে পাওয়া বাহুল্যের প্রত্যক্ষ দর্শন নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বসে! মানুষের কল্পনাশক্তির লালন-পালন অবহেলিত হতে লাগল। কল্পনার আকাঙ্ক্ষা, যা নাকি মানুষের শিল্পীসত্তাকে তৃপ্ত করে, তা আর ততো প্রয়োজনীয় রইল না জীবনে! যেমন বই-এর চেয়ে কমিক্স্-এর চাহিদা বেড়ে গেল। রামায়ণ-মহাভারত কমিক্স্ অথবা টি. ভি সিরিয়ালের খোরাক। সাহিত্যের ছোঁয়া নেই তাতে। এখন তো শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-ও কমিকসের মাধ্যমে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এবং তা করবে নাকি স্বয়ং বিশ্বভারতী!! রেডিয়ো নাটক মাত্রেই মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়, আর টি. ভি বা সিনেমা মানেই কমিক্স্—এ কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য নয়! ভালো এবং মন্দ সমস্ত মাধ্যমেই বর্তমান। টি. ভি সিরিয়ালেও আমরা নীনা গুপ্তা, অনিতা কাঁয়োয়ার, পঙ্কজ কাপূর, প্রিয়া তেন্ডুলকরের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী তো পেয়েছি। নাসিরুদ্দীন শাহ্ বা কবিতা চৌধুরিকে পেয়েছি। কথাটা তা নয়। আসলে 'মন্দ' এবং 'মোটাদাগের' কাজের 'দ্যাখ্‌তা' চটক কল্পনার প্রবণতাকে নষ্ট করছে। গভীর সাহিত্য আমাদের যে কল্পনার আনন্দ দেয়, যে উপলব্ধি দেয়, তা কখনোই কমিক্স্ দিতে পারে

না। রগরগে গোয়েন্দা কাহিনী বা ভাঁড়ানো জীবনের বোধকে, ভালোবাসাকে উদঘাটিত করতে পারে না—যা মনুষ্য সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক জীবনযাপনেই এই বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাতে যে সমাজের খুব একটা ভালো হয়নি দৈনন্দিন খবর তার সাক্ষ্য দেবে।

এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভাবলে হয়ত দেখা যাবে যে বেতার নাটকের গুরুত্ব হারিয়ে যাবার পিছনে অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান। সে বিশ্লেষণ করবেন অন্য কেউ—আমি একজন সামান্য অভিনেত্রী মাত্র। কিন্তু অনেক কারণেই মনে হয় এই বিশ্লেষণ হওয়াটার খুব প্রয়োজন।

আমার মনে পড়ে একদিন মুষলধারে বৃষ্টি। রাত থাকতেই শুরু হয়েছে। গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্ন নেই। জল জমে গেছে। তবু বৃষ্টিরও বিরাম নেই। সেদিন আধঘণ্টার একটি নাটকের রেকর্ডিং। আকাশবাণীতে। বছর চব্বিশেক বয়স হবে তখন। অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, অরুণ রায়, এবং আরও দু-একজন। কী করি! মা একটা প্যান্ট এনে দিয়েছিল বিদেশ থেকে। সেইটা গলালাম। একটা টেরিলিনের মেয়েলি সার্ট পরলাম। তার ওপরে টুপিওয়ালা বর্ষাতি, গামবুট এবং ছাতাও। পকেটে পার্স আর ছোটো তোয়ালে। বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ি থেকে হাঁটতে হাঁটতে জল ভেঙে, প্রায় চৌরঙ্গীর মোড় বরাবর পৌঁছে একটি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সময়ের একটু আগেই উপস্থিত হয়েছিলাম। একে একে বাকি সব্বাই এসে গেলেন এবং রেকর্ডিং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। সেদিন সম্ভবত একটি ছবি তোলা হয়েছিল। সেইরকম ছবি আকাশবাণীর সংগ্রহে থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আর একদিন মহলা আছে আকাশবাণীতে। প্রচণ্ড গরম তখন। রাস্তার পিচ্ গলে যাচ্ছে। সংসার সামলে বেরিয়েছি। বাস পেতে দেরি হয়েছে, উদ্বেগে ভুগছি। সময়ে পৌঁছতে যদি না পারি! সময় দিয়ে সময় না রাখতে পারা একটা ভীষণ অন্যায় কর্মের মধ্যে পড়ে ছোটবেলা থেকে সেই শিক্ষাই পেয়েছি। রাজভবনের কাছে মিনিবাস থেকে নেমেছি। দ্রুত হাঁটলে টায়-টায় সময়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা। এমনই কপাল—চটিটি গেল ছিঁড়ে। অমন রাজপথে কোথায়

মুচি, কোথায় কী! রাগের চোটে চটি জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে প্রায় দৌড়তে শুরু করি। উরেব্বাবা! রোদের তাপে রাস্তা এত গরম হয়? পায়ের তলা যেন জ্বলে যাচ্ছে। পৌঁছে তো গেলুম। এবং কাউকে খুলে কিছু বললুমও না। বেশি কেউ জানলেনও না যে খালি পায়ে এসেছি। আমিও নির্বিবাদে খালি পায়ে আকাশবাণী ভবনে ঘুরে বেড়ালুম। ফেরবার সময়ে অবশ্য ট্যাক্সিতে ফিরতে হল। পরে ওখানকার একজন অবাঙালী রিসেপসনিস্ট ছিলেন, তিনি বললেন, "সেদিন আপনার পায়ে জুতো ছিল না। আমি ভাবলাম হয়ত অশৌচ!" এরকম কত যে মজার ঘটনা ঘটেছে তার ঠিক নেই!

এমনও হয়েছে যেদিন সক্কালে রেকর্ডিং তার আগের রাত্তিরে আমার নিজেরই এক মাসি অত্যন্ত অকালে, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। সারা রাত মাসির বাড়িতে কাটিয়ে শোক এবং অসুস্থতা নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি রেকর্ডিং-এ। সেদিন আমার বিপরীতে অভিনয় করছিলেন দিলীপ রায়। যতদূর মনে পড়ে তাঁরও কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া সেদিনই মারা গিয়েছিলেন সকালে। তিনিও এসেছিলেন রেকর্ডিং করতে।

এখন আকাশবাণীতে খুবই কম যাওয়া হয়। আর শ্রাবন্তীর লিভিং সাউন্ডের অস্তিত্বই নেই। আকাশবাণীর মাইক্রোফোন, মেশিন এবং ট্রান্সমিশনের অবনতির ফলে খুব আগ্রহও হয় না। আর আকাশবাণীরও ততো আগ্রহ হয়তো হয় না। তাই যাওয়া প্রায় হয়ই না। পুরোনো সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে দেখাশোনাও হয় না। জীবনের এই-ই তো নিয়ম। কখন যে কোথা দিয়ে বাঁক ঘুরে যায় কেউ তা তো জানে না। তবে একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে এই শ্রুতিনির্ভর অভিনয়। তাই এ-সম্পর্কে একটু লিখবার সুযোগ পেয়ে বেশ ভালো লাগল!

লেখাটি *কোরক* পত্রিকার 'আকাশবাণী' সংখ্যায় প্রকাশিত এবং বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। মূল লেখায় রেবতীভূষণের করা পঙ্কজ কুমার মল্লিকের স্কেচটি আমরা বাদ দিয়েছি।